আবদুল বায়েস▷

‘পৃথিবী আবার শান্ত হবে...’

আমার এক বন্ধুর স্ত্রী শুচিবাইগ্রস্ত ছিলেন। ভদ্রমহিলা দিনে কয়েকবার গোসল করতেন, তাঁর বিছানায় কেউ বসলে সঙ্গে সঙ্গে চাদর বদলাতেন, জিনিসপত্র কেউ স্পর্শ করলে তা ছোঁয়ার আগে তিনি বারকয়েক ধুয়ে নিতেন। আমাদের সমাজে শুচিবাইগ্রস্ত মানুষকে এক ধরনের মানসিক রোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

করোনার সময় আমার অবস্থা অনেকটা ওরকমই। পারতপক্ষে বাসা থেকে বের হই না। দিনে বেশ কয়েকবার সাবান দিয়ে হাত ধুই কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করি। ঘরের ভেতর মাস্ক পরে বসে থাকি, কেউ কলিংবেল টিপলে চিৎকার করে সবাইকে মাস্ক পরতে বাধ্য করি। স্বভাবতই আমার খানায় আমাকে একজন মানসিক রোগী হিসেবে ভাবা শুরু হলো—অন্তত আমার দিকে সবার তাচ্ছিল্যভর তাকানো তারই ইঙ্গিত বহন করে।

এইতো মাত্র কয়েক দিন আগের কথা। গিন্নি বললেন, নাতির মুসলমানি হয়েছে, তাই ইন্দিরা রোডের বাসায় তাকে একটু দেখতে যাওয়া দরকার। গিন্নি খুব অসুস্থ বলে আমার ঘাড়ে পড়া দায়িত্বটা পালন করতে আমি বাধ্য। বের হওয়ার আগে বারদুয়েক দোয়া পড়ে নিলাম, এই তীব্র গরমের মধ্যে গায়ে ফুল শার্ট আর পায়ে মোজা পরলাম, মুখে তো ডাবল মাস্ক আছেই। গাড়িতে বসেই হ্যান্ড স্যানিটাইজারের দিকে হাত বাড়িয়ে বারতিনেক হাত মলে নিলাম। যতক্ষণ বেয়াইনের বাসায় ছিলাম মাস্ক পরেই অজানা জীবাণুর ভয়ে দোয়াদরুদ পড়তে পড়তে নাতির খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। তবে বেয়াইনের নিজের গাছের কাঁঠালের দুইখানা কোষ আর তাঁর কন্যার আনা কেকের এক পিস মুখে দিতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাস্ক সরাতে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে বাবার এমন পাগলামো ব্যবহার দেখে মেয়ের লজ্জা পাওয়ারই কথা। জানি সে লজ্জা পেয়েছে কিন্তু বলতে পারেনি—আফটার অল বাবা বলে কথা।

শেকসপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে এ রকম একটা পরিস্থিতির উল্লেখ আছে। লেডি ম্যাকবেথ রাজা ডানকানের হত্যার পর নাকি সারা দিন হাত ধুতো আর সুগন্ধি মাখাত রক্তের গন্ধ দূর করার জন্য। কিন্তু রক্তের গন্ধ দূর হতো না। হাত ধোয়ার পর নাকের কাছে এনে বিরক্তির সুরে বলত : All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.

সারা বিশ্ব তথা বাংলাদেশের মানুষ এখন করোনার ভয়ে এতই ভীতসন্ত্রস্ত যে শুধু সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই। মনে হয়, সারা বিশ্বের স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুলেও যেন আমাদের হাত করোনামুক্ত হচ্ছে না বা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সন্দেহ দানা বেঁধেছে—কেউ কাউকে দাওয়াত দিচ্ছে না পাছে করোনা সংক্রমিত হয়।

জাবিতে আমার সাবেক সহকর্মী আফসার আহমেদ লিখেছেন, “মনের ভেতর কেবলি অদেখা জীবাণুর একটি ভীতিকর ধারণা ভাসে। তবে কি করোনা আমাদের চেতন-অবচেতন জুড়ে যে সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলছে তার থেকে আমাদের মুক্তি নেই? আর এভাবেই ক্রমাগত সমাজ থেকে পরিবার, পরিবার থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি এবং শরীর থেকে মন সম্পর্কহীন হয়ে পড়ছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ থেকেই এই বিচ্ছিন্নতা। ফলে ক্ষয়ে যাচ্ছে সম্প্রীতি ও মানবিক সৌহার্দ্য। এই করোনাকালে একটি স্বাভাবিক কাশি কিংবা হাঁচি দিলে শুধু অন্যকেই নয়, নিজের ওপরেও সন্দেহ দানা বাঁধে করোনা বাসা বাঁধল নাকি! এ কেমন জীবাণু যে শুধু ঘাতকরূপেই নয়, মানুষের ভেতরে অবিশ্বাসের ভাইরাস হয়েও প্রবেশ করল। এভাবে শুধু একে অপরের ওপর নয়, মানুষ নিজের ওপরও বিশ্বাস হারাচ্ছে। করোনা থেকে বাঁচার আশায় মানুষ হাত ধুচ্ছে, মাস্ক পরছে ঠিকই; কিন্তু ঘরের বাইরের এবং ঘরের মানুষের কাছে ক্রমাগত ‘সাবজেক্ট’ থেকে ‘অবজেক্ট’ হয়ে উঠছে। অবজেক্টের আর যা-ই থাকুক, আবেগ থাকে না। এভাবে মাস্কে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের মুখের চিরচেনা মানবিক আবেগের অভিব্যক্তির চিহ্নগুলো। মাস্কের আড়ালে বস্তুতে রূপান্তরিত হয় মানুষ।

“করোনার পরে যে বিশ্ব আসবে সেখানে বদলে যাবে মানবিক সম্পর্ক ও অনুভূতি প্রকাশের ধরন। বদলে যাবে শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিনিয়ত বদলের ধারাবাহিকতায় বদলে যাবে প্রচলিত সব পারফরমিং আর্টের ধারণা। আমাদের ভাবতে হবে সামনের সময়ের পারফরমিং আর্টসের রূপ-রূপান্তর নিয়ে। মানুষের প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পর্কই বা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা-ও ভাবনার বিষয়। বিনোদন থেকে ইবাদত—সব কিছুই যদি ক্রমাগত একলার হতে থাকে, তবে সমষ্টির আনন্দ কি একেবারেই হারিয়ে যাবে? আর কয়েক বছর পরের মানুষ কি আমাদের আগের সম্পর্কগুলোকে অতীতের ভাবতে শুরু করবে? পরিবর্তিত বিশ্বে আমরা কি নিজের কাছেই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হব : ‘আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে—কিছুই কি নেই বাকি?’

“তবু আমি নিয়ত বিশ্বাস করি, পরিবর্তিত সেই বিশ্বে মানুষ ঠিকই এককোষী অ্যামিবার মতো আবার নিজেকে নতুন করে তৈরি করে নেবে। করোনার এই মারণভীতি সেই সময়ে শুধু ধূসর অতীত মনে হবে। কারণ নিজের শক্তিতে মানুষ একদিন দাঁড়াবেই।”

নচিকেতার গানের দুটি কলি না হয় গাওয়া যাক :

‘একদিন ঝড় থেমে যাবে
পৃথিবী আবার শান্ত হবে,
বসতি আবার উঠবে গড়ে
আকাশ আলোয় উঠবে ভরে।’

লেখক : সাবেক উপাচার্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়